# ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা( The Preamble to the Constitution of India)

১৭৮৭ সালে প্রণীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা যোগ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের মূল প্রস্তাবনার সঙ্গে কিছু অংশ সংযোজিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের বর্তমান প্রস্তাবনাটি হল ঃ

আমারা ভারতের জনগণ, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প করে ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Sovereign Socialist Secular Democratic Republic) রূপে গড়ে তুলতে এবং এর সব নাগরিক যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার (Justice); চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপসনার স্বাধীনতা( Liberty); মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য(Equality) ভোগ করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির ঐক্য ও সংহতি (Unity and integrity of the Nation)র নিশ্চয়তা সাধন করার উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ(Fraternity)এর প্রসারকল্পে আজ ১৯৪৯ সালের ছাব্বিশে নভেম্বর আমাদের গণপরিষদে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

[We, the people of India, having solemly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens;
Justice, social, economic and political;
Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;
Equality of status and of opportunity; and to promote among them all
Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;
In Our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do Hereby Adopt, Enact and Give To Ourselves This Constitution.]

ভারতের সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় ‘সমাজতন্ত্র’। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ এবং ‘সংহতি’ শব্দগুলি ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই শব্দগুলি প্রস্তাবনার মধ্যে সংযোজিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে যেসব ‘সর্বোচ্চ বা মৌলিক সাংবিধানিক মূল্যবোধ’(the suprem or fundamental constitutional values) এর কথা বলা হয়েছে, সেগুলির মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণেতাদের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্খা ও মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে বলে সুভাষ কাশ্যপ নামক একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ তাঁর আওয়ার কনস্টিটিউশন (Our Constitution) নামক পুস্তকে মন্তব্য করেছেন। এইসব ‘সর্বোচ্চ বা মৌলিক সাংবিধানিক মূল্যবোধ’-গুলি হল ঃ ১) সার্বভৌমিকতা, ২) সমাজতন্ত্র, ৩) ধর্মনিরপেক্ষতা, ৪) গণতন্ত্র, ৫) সাধারণতান্ত্রিক প্রকৃতি, ৬) ন্যায়বিচার, ৭) স্বাধীনতা, ৮) ভ্রাতৃত্ববোধ, ৯) ব্যক্তির মর্যাদা এবং ১০) জাতির ঐক্য ও সংহতি।

## ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব ঃ

সংবিধান হল যে-কোন দেশের সর্বোচ্চ আইন। এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। প্রস্তাবনা হল সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধ। যে-কোন বইয়ের ক্ষেত্রে পাঠক যেমন ভূমিকা পাঠ করে গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারে, তেমনি একই কথা সংবিধানের প্রস্তাবনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রত্যেক দেশের সংবিধানের একটি মতাদর্শগত ভিত্তি থাকে। নির্দিষ্ট কতকগুলি আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে সংবিধান গড়ে ওঠে। সুস্পষ্ট কতকগুলি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে সংবিধানের সম্পূর্ণ কাঠামোটি তৈরী হয়। একেই বলে সংবিধানের দর্শন বা দার্শনিক ভিত্তি। প্রস্তাবনা সংবিধানের অন্তরাত্মা। সংবিধানের কার্যকরী অংশে প্রবেশের এ হল একটি চাবিকাঠি। এর দ্বারা সংবিধান রচয়িতাদের ইচ্ছা, সংবিধানের উৎস এবং আইনগত ও নৈতিক ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রস্তাবনা থেকে সংবিধানের আদর্শগত ভিত্তি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অনুমোদনের প্রকৃতি জানা যায় এবং সরকারী কাঠামোর ধরণ-ধারণ, সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। অর্থাৎ প্রস্তাবনা হল সংবিধানের নির্যাস স্বরূপ।

তবে প্রস্তাবনা কিন্তু সংবিধানের কার্যকরী অংশের অর্ন্তভূক্ত নয়। সংবিধানের মূল অংশের আগেই প্রস্তাবনাকে সংযুক্ত করা হয়। এই কারণে প্রস্তাবনার আইনগত গুরুত্ব সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়। সংবিধানের মূল অংশই আইনানুসারে স্বীকৃত, গৃহীত ও বলবৎযোগ্য। আইনগত বিচারে প্রস্তাবনা গুরুত্বহীন। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বেরুবাড়ী সম্পর্কিত মামলায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, সংবিধানের অংশ হিসাবে প্রস্তাবনা গণ্য হতে পারে না। প্রস্তাবনাকে সরকার ও তার বিভাগসমূহের মূল ক্ষমতার উৎস হিসাবেও বিবেচনা করা যায় না।

মূলত তিনটি কারণে ভারতীয় সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত হয়েছে। ১) সংবিধানের উৎস, আইনগত ভিত্তি ও নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে প্রস্তাবনা ইঙ্গিত দেয়। ২) প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্য, নীতিসমূহ ও সংবিধান গ্রহণের তারিখ উল্লিখিত আছে। ৩) প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অস্পষ্ট শব্দ বা বাক্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। ৪) প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির পরিধি সম্পর্কে অধিকতর বিশদভাবে অবহিত হওয়া যায়।

প্রস্তাবনার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত ঃ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য হল এই যে, এখানে সর্বকালের গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক আদর্শগুলিকে সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। সংবিধানের কার্যকরী অংশের এমন সুন্দর ভূমিকা খুব কমই দেখা যায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার (Ernest Barker) এই প্রস্তাবনাকে 'Testament of his old age' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, প্রস্তাবনাটি ভারতীয় সংবিধানের উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান অংশ।

এই প্রস্তাবনা সংবিধানের অস্পষ্ট অংশ ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। কিন্তু স্পষ্ট অংশের অর্থকে সংকুচিত বা প্রসারিত করতে পারে না। সংবিধানের কার্যকরী অংশের আইনগত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রস্তাবনার ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। সংবিধানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা করতে হবে মূলতঃ কার্যকরী অংশের অন্তর্ভূক্ত অনুচ্ছেদসমূহের ভিত্তিতে; প্রস্তাবনার ভিত্তিতে নয়। বস্তুতঃ আইনগত বিচারে প্রস্তাবনার বিশেষ কোন মূল্য নেই। সংবিধানের কার্যকরী অংশের আইনগত বিচারে প্রস্তাবনার ভূমিকা খুবই সীমিত। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেনের মতে, এই প্রস্তাবনা হল 'নিষ্ঠাপূর্ণ সংকল্প'। কিন্তু সংকল্প ও কার্যকরী আইন এক নয়। সংবিধান সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অংশ হিসাবেই গণ্য করা হয়।

বিচারপতি গজেন্দ্র গাদকরের অভিমত অনুযায়ী প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়। প্রস্তাবনা সূত্রে আইনসভা বা রাষ্ট্রের অন্য কোন সংস্থা বিশেষ কোন ক্ষমতা পায়নি। এই প্রসঙ্গে সংবিধান বিশেষজ্ঞ এস. সি কাশ্যপ (S.C. Kashyap) এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রস্তাবনা কোনও ক্ষমতার উৎস হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে আবার প্রস্তাবনা কোন ক্ষমতার ওপর সীমাবদ্ধতাও আরোপ করতে পারেনা।

## আমরা ভারতের জনগণ (We, the people of India)ঃ

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলে হয়েছে, 'আমরা ভারতের জনগণ ..... ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর আমাদের গণপরিষদে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি'। এর অর্থ ভারতের জনগণই সংবিধানের রচয়িতা এবং চরম সার্বভৌম ক্ষমতার আধার। কে. ভি. রাও-এর মতে, 'আমরা ভারতের জনগণ' - এই কথাগুলির তাৎপর্য হল - ভারতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের রাজা বা ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের বিলোপ সাধন করা হয়েছে। এই অর্থে জনগণই দেশের সংবিধানের মূল রচয়িতা।

এই প্রসঙ্গে এইচ. ভি. কামাথ মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, গণপরিষদের সদস্যরা ব্যক্তিবিশেষ নন; তাঁরা হলেন ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি। গনপরিষদে তাঁরা সকল ভারতবাসীর নামে এবং ভারতীয় জনগণের পক্ষে সংবিধান রচনার কাজ করেছেন। সুতরাং আইনগত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে ভারতীয় জনগণকেই চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। গণপরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. বি. আর. আম্বেদকার বলেছিলেন যে, ভারতীয় সংবিধানের উৎস জনগণ এবং এর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমিকতা জনগণেরই হাতে ন্যস্ত রয়েছে। যেহেতু ভারতের সংবিধান জনগণ কর্তৃক রচিত ও গৃহীত হয়েছে, সেজন্য একে মান্য করা প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য।

সুপ্রীমকোর্টও সংবিধানের এই গণভিত্তিক চরিত্রকে স্বীকার করে নিয়েছে। এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার (১৯৫০) রায়দানকালে বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতীয় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

ভারত সরকার বনাম মদনগোপাল মামলায় বিচারপতিগণ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। সংবিধান বিশেষজ্ঞ সুভাষ কাশ্যপের মতে, প্রস্তাবনায়, 'আমরা ভারতের জনগণ ... এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি' - এই কথাগুলির মাধ্যমে সংবিধান প্রণেতারা গভীর প্রত্যয়ের সাথে এ কথাই ঘোষণা করেন যে, সার্বভৌমিকতা ভারতের সকল জনগণের হাতে অর্পিত হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের হাতে পৃথক পৃথকভাবে নয়। এদিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, ভারতের সমগ্র জনগণ হল একটি যৌথ সত্তা এবং একটি অবিভাজ্য সার্বভৌম একক।

সমালোচনা ঃ

১) যে গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধান রচনা করেছিল, সেই গণপরিষদের সদস্যরা সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত হননি। সমগ্র ভারতীয় জনগণের শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ ভাগ্যবানের দ্বারা প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যবৃন্দ নির্বচিত হয়েছিলেন। আবার, ঐসব প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কে. সি. হোয়ার বলেছেন, গণপরিষদে ভারতীয় জনগণ সংবিধান রচনা করেছে বলে বলা হয়। কিন্তু ভারতীয় জনগণের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল।

২) সংবিধান রচিত হওয়ার পর আয়ারল্যান্ডে যেমনভাবে সংবিধানকে গণভোটে পেশ করা হয়েছিল, ভারতে সেরূপ করা হয় নি। ফলে রচিত সংবিধানের প্রতি জনগণের কতখানি সমর্থন ছিল, তা বোঝা যথেষ্ট কঠিন। কে. ভি. রাওয়ের মতে, কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের ওপর সংবিধানকে চাপিয়ে দিয়েছে।

৩) ১৯৪৯ সালে গৃহীত ভারতের সংবিধানের উৎস হল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৯৪৭ সালে প্রণীত 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' (Indian Independence Act) । এই আইন বলেই গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধান রচনায় সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেছিল। ব্রিটিশ আইনের দ্বারা যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে, তা কখনোই নিজেকে ভারতীয় জনগণের বলে দাবী করতে পারে না বলে ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন মন্তব্য করেছেন।

৪) ভারতীয় গণপরিষদে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিরাও ছিলেন। সুতরাং গণপরিষদের সদস্যদের একটি অংশ রক্ষণশীল সামন্ততন্ত্রের এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র হিসাবে থাকায় গণপরিষদ গণচরিত্র লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচকদের অভিমত।

সমালোচনার উত্তর ঃ

১) তৎকালীন ভারতের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গণপরিষদ গঠন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠন করতে গেলে অযথা অনেক সময় ব্যয়িত হত। ফলে সংবিধান রচনার কাজে বিলম্ব ঘটত।

২) গণপরিষদের সদস্যদের জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও পরিষদের গঠন-প্রকৃতি অপরিবর্তিতই থাকত বলে মনে করা হয়। কারণ, ওই সময় জনমানসে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল না। জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না হলেও গণপরিষদে নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আজাদ প্রমুখ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দই স্থান লাভ করেছিলেন

৩) সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর ১৯৫২ সালে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নতুন কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয়, সেই আইনসভা গঠিত হয়, সেই আইনসভা গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানকে অপরিবর্তিতভাবেই গ্রহণ করেছিল। এর অর্থ- গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানের প্রতি জনসাধারণ তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

৪) অনেকের মতে, ভারতীয় সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতের জনগণ কার্যত তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যে কোন সময় সংবিধান সংশোধন করার অধিকারী। এইভাবে ভারতের জনগণকে সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রকৃত আধার হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার ঃ

তবে একথা সত্য যে, অপরাপর পুঁজিবাদী দেশের মতো ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিত্তশালী-শ্রেণির প্রাধান্যপ্রতিপত্তি থাকার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীর সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা এবং দেশের সমকালীন রাজনৈতির গতিপ্রকৃতি বিচারবিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভারতে গণসার্বভৌমিকতা কার্যক্ষেত্রে প্রভুত্বকারীশ্রেণীর সার্বভৌমিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

সার্বভৌম ঃ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে 'একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারত-রাষ্ট্র সার্বভৌম কি না তা জানতে হলে সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝায়, তা আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবাধ ক্ষমতাকে বোঝায়। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার দুটি দিক আছে, যথা - ১) অভ্যন্তরীণ এবং ২) বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলতে বোঝায় - রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে রাষ্ট্রের আইন হল চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহত। কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সেই আইন অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতাকেই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলে।

এদিক থেকে বিচার করে ভারতকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়। কারণ, ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাষ্ট্রীয় আইনই চূড়ান্ত। যে-কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য। সুভাষ কাশ্যপের মতে, ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজিত হলেও সার্বভৌমিকতার কোনো বিভাজন করা হয়নি। জরুরী অবস্থার সময় জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রের একাধিপত্য সংবিধানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা অনুযায়ী সাধারণ অবস্থাতেও রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার, কোন রাজ্য বা রাজ্যসমূহের গোষ্ঠী সংবিধানকে অস্বীকার করতে কিংবা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

এমনকি, সংবিধানের ১(৩)(গ) নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশি রাজ্য যেমন অধিকার করতে পারে, তেমনি তা সংবিধানের নির্দেশ মেনে ভারতের কোনো অংশ বেদেশি রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করতে সক্ষম। সংবিধানের ২, ৩ ও ৪ নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্ট সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্য গঠন ও পুনর্গঠন, রাজ্যের নাম পরিবর্তন প্রভৃতি করতে পারে। সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতে দ্বি-নাগরিকত্ব নেই; তার পরিবর্তে এখানে নাগরিকদের এক-নাগরিকত্ব স্বীকৃতিলাভ করেছে। অনুরূপভাবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত সরকার স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে পারে; কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে ভারত-রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না। সুতরাং বলা যায়, ভারত অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সমাজতান্ত্রিক ঃ

ভারতের মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘সমাজতান্ত্রিক’ কথাটি ছিল না। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২-তম সংশোধনে ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কী ধরনের সমাজতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে সংবিধানে কোনো কথা বলা হয় নি। অধ্যাপক কোল(Cole) সমাজতন্ত্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যথা - ১) সমাজতন্ত্র পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ একটি শ্রেণীহীন ও বর্ণহীন সমাজব্যবস্থা; ২) এই ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকে না; ৩) উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মালিকানা সাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে ও সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং ৪) প্রত্যেকে নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজ কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করে।

কিন্তু দাবি করা হয় যে, ভারতে এক নতুন ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ভারতীয় সমাজতন্ত্রে যে ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র(state socialism) নয়। কারণ এরূপ সমাজতন্ত্র উৎপাদনের উপায়সমূহের জাতীয়করণ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধনের নীতিতে বিশ্বাস করে না। তিনি ভারতীয় সমাজতন্ত্রকে 'আমাদের নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্র'(Our own brand of sociolism) বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'যেসব ক্ষেত্রে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করব, সেগুলির জাতীয়করণ করা হবে। তবে কেবল জাতীয়করণ আমাদের সমাজতন্ত্র নয়'। কিন্তু ভারতের মূল সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে মৌলিক অধিকারের অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধন করার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের কৌলিন্য হারালেও তা বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভূক্ত।

তাছাড়া, ভারত সরকারের ঘোষিত অর্থনৈতিক নীতিসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy) প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য বর্তমান। তাছাড়া সম্প্রতিককালে পি. পি. পি. (Public Private Partnership) অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী যৌথ অংশীদারিত্বের নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি শ্রেণীর অবাধ লুণ্ঠনের গতি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক বন্টনের ব্যবস্থা না থাকায় ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা নিছক বাকসর্বস্বতার পর্যায়ে থেকে গেছে। বস্তুত, ভারতে যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে সোনার পাথর বাটির মতো অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, এরূপ সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন, শ্রেণীসংগ্রামের অপরিহার্যতা প্রভৃতি তত্ত্বে যেমন আস্থাশীল নন, তেমনি তাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে কিংবা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার অবাস্তব স্বপ্ন দেখেন। সুতরাং বলা যায়, প্রকৃত অর্থে সমাজতন্ত্র বলতে যা বোঝায়, ভারতে তা আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

ধর্মনিরপেক্ষ ঃ

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। যাঁরা ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী, তাঁদের মতে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে যে মাণদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, সেই মাণদণ্ড ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আদৌ সমীচীন নয়। একটি বিশেষ অর্থে ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করা যায় বলে তাঁরা মনে করেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি. ই. স্মিথ (D. E, Smith) বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল এমন এক রাষ্ট্র, যা ব্যক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে, যা ধর্মীয় মতামত নির্বিশেষে সব ব্যক্তিকে নাগরিক হিসাবে গণ্য করে এবং যা সাংবিধানিকভাবে বিশেষ কোন ধর্মের সাথে নিজেকে যুক্ত করে না কিংবা বিশেষ কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিরোধীতা করে না। গণপরিষদে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে অনন্তসায়নম আয়েঙ্গার বলেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষ বলতে একথা বলতে চাইছি না যে, কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ হল - রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মকে সাহায্য করবে না, কিংবা এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না।

এইচ. ভি. কামাদ গণপরিষদে বলেছিলেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেমন ঈশ্বরহীন রাষ্ট্র হবে না, তেমনি তা অধার্মিক বা ধর্মবিরোধীও হবে না। সে যাইহোক, শেষ পর্যন্ত মূল সংবিধানের কোথাও ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে বর্ণনা না করা হলেও ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংযোজন করা হয়। 'সর্বধর্ম মনোভাব' অর্থাৎ সব ধর্মের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন - এই অর্থে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হলেও এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা কিন্তু বলা হয় নি। তার ফলে ভারতের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এবং হিন্দু মৌলবাদীরা নিজেদের ইচ্ছামতো ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে।

গণতান্ত্রিক ঃ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে কী ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিলেন। আম্বেদকর এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যারা সরকার গঠন করবে, সংবিধান তাদের সামনে একটি আদর্শ (an ideal)তুলে ধরেছে। সেই আদর্শটি হল অর্থনৈতিক গণতন্ত্র(economic democracy) তিনি আরও বলেছিলেন, সামাজিক গণতন্ত্রের ওপর স্থিতিশীল না হলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সামাজিক গণতন্ত্র বলতে তিনি সেই জীবনধারা(a way of life) কে বোঝাতে চেয়েছেন, যা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে ‘জীবন নীতি’ (the principle of life) হিসাবে গ্রহণ করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি ঃ ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে নাগরিকদের নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা হলেও কার্যক্ষেত্রে সেইসব অধিকার অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এখানে উৎপাদনের উপাদানগুলি ওপর সামাজিক মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সম্পত্তিশালী শ্রেণী কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছে। আবার সংবিধানে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও ভারতীয় সমাজজীবনে তা এখনও দুষ্ট ক্ষতের মতো অবস্থান করছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঃ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারগুলির স্বীকৃতি, একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি, শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে সরকারের পরিবর্তন, সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি প্রভৃতি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ভারতে বর্তমান। তাই ভারতকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশ বলে অভিহিত করা হয়।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন ঃ কিন্তু এক্ষেত্রে সমালোচকরা বলেন যে, ভারতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো পরিবেশের অভাব ভারতীয় গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেছে। তাছাড়া রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (criminalization of politics) বর্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ করে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত রাজ্যসরকারগুলিকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে বরখাস্ত করা, বিভিন্ন প্রকার অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্স জারি কিংবা আইন প্রণয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে নাগরিকদের বাকস্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, সরকারের সমালোচনা করার স্বাধীনতা প্রভৃতিকে খর্ব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে 'বোইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (Unlawful Activities Prevention Act [UAPA], ১৯৬৭ )-এর কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। এছাড়া 'পোটা'(POTA-Prevention of terrorism Act), 'টাডা'(TADA- Terrorist and Disruptive Activities [Prevention] Act, ১৯৮৭) ইত্যাদি আইনগুলোর কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণতন্ত্র ঃ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সাধারণতান্ত্রিক দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা ঃ ১) সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকাসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন না। তাঁকে জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বচিত হতে হয়। ২) এরূপ শাসন ব্যবস্থায় জনগণই হল সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস। এবং ৩) জনগণের কল্যাণসাধনই সাধারণতান্ত্রিক সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। সাধারণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বিচার করে ভারতকে একটি সাধারণতান্ত্রিক দেশ বলে অভিহিত করা হয়। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণির মতো উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করে না।

তাঁকে ৫ বছরের জন্য ভারতীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হয়। তাছাড়া, ভারতের জনগণই হল সার্বভৌম শক্তির কেন্দ্রবিন্দু, অর্থাৎ সরকারের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস। নির্বচিত রাষ্ট্রপতি সংবিধান বিরোধী কোন কাজ করলে, তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট বা অভিযোগ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকালের মেয়াদ পরিসমাপ্তির পূর্বেই জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পার্লামেন্ট তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে। এইসব কারণে ভারতকে একটি সাধারণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করার ফলে ভারতের সার্বভৌম ও সাধারণতান্ত্রিক চরিত্র অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে ভারতকে যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণির নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কিন্তু সমালোচকদের এই অভিমত অনেকে গ্রহণ করতে রাজি নন। কারণ ১) ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সংবিধান কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে ভারতের ওপর ব্রিটিশ রাজশক্তির আইনগত ও সাংবিধানিক কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। ভারতে রাষ্ট্রপতির নামেই যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কার্যাদি পরিচালিত হয়। ২) কমনওয়েলথ হল স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, ভারত স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে কমনওয়েলথে যোগ দিয়েছে এবং প্রয়োজন মনে করলে সে স্বাধীনভাবে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। সুতরাং কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করার ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি (Justice, Liberty, Equality, Freaternity etc.)

ন্যায় (Justice) ঃ সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতা আচরণ ও প্রচার নিষিদ্ধ করে সামাজিক ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ভেদনীতির বিরুদ্ধে সংবিধান রচয়িতারা সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শসমূহ গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র-পরিচালনার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে সংবিধানের চতুর্থ অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা না হলে সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় - এই সত্যটি সংবিধান রচয়িতাগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা সংবিধানের চতুর্থ অংশে অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও বন্টন, নাগরিকদের কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী প্রদান, শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারে কর্তব্য বলে ওই সকল নির্দেশমূলক নীতিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক ভারতীয় নাগরিককে সমানভাবে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া তপশিলি জাতি ও উপজাতির মতো সংখ্যালঘুদের জন্য নির্বাচনে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে দাবী করা হয়।

কিন্তু বাস্তবের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বুর্জোয়া জমিদার শাসন কায়েম হওয়ার ফলে সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পয়েই চলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্য থাকায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। তাই বর্ণ-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি পুঁজিবাদের সহজাত কুফলগুলি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং ভারতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

স্বাধীনতা (Liberty) ঃ

প্রস্তাবনায় নাগরিকদের চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত 'স্বাধীনতার অধিকার' (১৯-২২ নং ধারা) এবং 'ধর্মের অধিকার' (২৫ - ২৮ নং ধারা) প্রদান করে প্রস্তাবনায় বর্ণিত ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং অর্ডিনন্যান্স ও আইন প্রণয়ন করে ওইসব স্বাধীনতার অধিকারকে খর্ব কর হয়েছে বলে সমালোচকদের অভিমত। বিশেষত, ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারি করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত নাগরিকদের সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করেছিল।

## সাম্য (Equality) ঃ

সাধারণভাবে সাম্য বলতে প্রত্যেকের সমান সুযোগসুবিধা লাভের অধিকারকে বোঝায়। প্রস্তাবনায় মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার যে-কথা বলা হয়েছে, তাকে সংবিধানের ১৪-১৮ নং ধারার মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা না হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনিক-বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিদ্যমান থাকার ফলে মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে তারাই অগ্রাধিকার লাভ করে।

ভ্রাতৃত্ববোধ (Fraternity) ঃ

ভারতের মতো বিশাল দেশে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ বসবাস করে। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ভিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। তাই প্রস্তাবনায় ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল - মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংহতি রক্ষার কথা বলা ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতে একনাগরিকত্ব ব্যবস্থা যেমন বর্তমান রয়েছে, তেমনি আবার সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ প্রভৃতির ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করার ফলে সব নাগরিক সমানভাবে মৌলিক অধিকার ভোগ করতে সক্ষম।

তাছাড়া, সংবিধানের ৪(ক) অংশে 'ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ' করাকে অন্যতম মৌলিক কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হল ভারতবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করা। একই সঙ্গে বিশ্বভ্রাতৃত্বের এই সুমহান আদর্শের বাস্তব রূপায়ন ঘটেছে ভারতীয় সংবিধানের ৫১ নং ধারার মধ্যে। এই ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতি বিধান, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সালিশির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের কথা বলা হয়েছ।

## ব্যক্তির মর্যাদা (Dignity of the Individual)

ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার সব প্রয়াস ব্যর্থ হবে যদি ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা না হয়। তাই প্রস্তাবনাতে ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য সংবিধানে প্রত্যেককে মৌলিক অধিকার ভোগের সমান অধিকারই কেবল প্রদান করা হয় নি, সেই অধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ এবং উচ্চ-নীচ জাতি নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। তাছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ও বৈষম্য বর্তমান থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের কাছে মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তাই সংবিধানের চতুর্থ অংশে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী প্রদান; শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিশ্রামভোগ এবং সামাজিক ও কৃষ্টিগত সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ; দুর্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলিকে সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

## জাতীয় ঐক্য ও সংহতি (Unity and Integrity of the Nation)

সংবিধানের প্রস্তাবনায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কায়েমী স্বর্থবাদীদের চক্রান্তে আজ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রদায়িকতা, প্রদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। এই সংগ্রাম কেবল জাতীয় ক্ষেত্রে পরিচালনা করলে চলবে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

উপসংহার ঃ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা স্বদেশে ও বিদেশে বহু প্রোথিতযশা ব্যক্তির দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আর্নেস্ট বার্কার (~~Arnest Barker~~) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটিকে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রিন্সিপলস ওফ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিওরি (Principles of social and political theory)-র মূল সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই প্রস্তাবনাটি উদ্ধৃত করতে আমি গর্ববোধ করছি এই কারণে যে, ..... ভারতের জনগণ তাদের স্বাধীন জীবন শুরু করেছে এমন একটি রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে, যা আমরা, পশ্চিমের লোকেরা, 'পশ্চিমি' বলে থাকি। কিন্তু সেটি আজ 'পশ্চিমি'র চেয়েও বেশি কিছু'। এরূপ স্বীকৃতির মাধ্যমেই প্রস্তাবনার মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তিটি খুঁজে পাওয়া যায়। বার্কার ছিলেন 'সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ'-এর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। তিনি তাঁর সংশোধনমূলক উদারনৈতিক তত্ত্বের প্রধান দিকগুলি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই এই প্রস্তাবনাকে সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদের তথা বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া দর্শনের তত্ত্বগত ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

## ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা কি সংশোধনযোগ্য

সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা অনুযায়ী প্রস্তাবনা সংশোধনযোগ্য কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এমনকি, সুপ্রিমকোর্টও বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন ধরনের রায় দিয়েছে। এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ হল - প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় আইনগত দিক থেকে এর বিশেষ কোন মূল্য নাই। এমনকি, প্রস্তাবনার সাথে সংবিধানের মূল অংশের বিরোধ দেখা দিলে আদালত বিভিন্ন মামলায় প্রস্তাবনার পরিবর্তে সংবিধানের মূল অংশকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা অনুযায়ী প্রস্তাবনা সংশোধনযোগ্য কি না - কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় (১৯৭৩) সুপ্রিমকোর্টের কাছে এই প্রশ্নটি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। ওই মামলায় আবেদনকারীর মূল বক্তব্য ছিল ৩৬৮ নং ধারায় প্রদত্ত সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সীমাহীন নয়। এরূপ ক্ষমতার ওপর প্রস্তাবনা অনুমিত সীমাবদ্ধতা আরোপ করছে।

কারণ, প্রস্তাবনার মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের প্রথমিক উপাদানগুলি বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সেগুলির ক্ষতি সাধন বা ধ্বংসসাধন আদৌ করা যায় না। তা ছাড়া, প্রস্তাবনা যেহেতু সংবিধানের অংশ নয়, সেহেতু ৩৬৮ নং ধারার মাধ্যমে তা সংশোধনযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ এই ধারাটি কেবল সংবিধান সংশোধনের সঙ্গেই যুক্ত। ১৯৬০ সালে বেরুবাড়ি মামলায় সুপ্রিমকোর্টও অনুরূপ রায় ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কেশবানন্দ ভারতী মামলায় অ্যাটর্নি জেনারেল আবেদনকারীর বক্তব্যের বিরোধীতা করে এই যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, ৩৬৮ নং ধারায় লিপিবদ্ধ সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে পার্লামেন্ট প্রস্তাবনাকেও সংশোধন করতে সক্ষম। কারণ, প্রস্তাবনা হল সংবিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এই ধারার মাধ্যমে সংবিধানের অন্যান্য অংশের মতোই প্রস্তাবনাকেও সংশোধন করা যায়।

কেশবানন্দ ভারতী মামলায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, বেরুবাড়ি-সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত ভ্রান্ত ছিল। কারণ, সংবিধানের অন্যান্য অংশের মতো প্রস্তাবনাও তার একটি অংশ। তাঁদের মতে, সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারার প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রস্তাবনার সংশোধন করা গেলেও এর 'মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি'কে কোনোভাবেই সংশোধন করা যায় না। কারণ, 'আমাদের সংবিধানরূপ অট্টালিকা প্রস্তাবনায় উল্লিখিত মৌলিক উপাদানগুলির ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। এই সকল উপাদানগুলির কোনো একটিকে যদি অপসারণ করা হয়, তাহলে সাংবিধানিক কাঠামোটির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' সুপ্রিমকোর্টের মতে, এরূপ করা হলে ভারতীয় সংবিধান তার আদি রূপ কিংবা স্বকীয় পরিচিতি হারিয়ে ফেলবে।

৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার পরিবর্তন ঃ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার মধ্যে 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' শব্দ তিনটি সংযোজিত হয়। ওই সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নতাবাদী অশুভ শক্তির আবির্ভাব ও বিকাশের ফলে ভারতের জাতীয় সংহতি যেমন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তেমনি সাম্প্রদায়িক শক্তির আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সুমহান আদর্শ বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। তাই এই সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার সংশোধন ঘটিয়ে এই সকল মৌলিক নীতিকে প্রস্তাবনায় সংযোজন করা হয়েছিল। তাই বলা যায় যে, ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে তিনটি মৌলিক নীতি বা আদর্শ সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযোজিত হয়, সেগুলি প্রস্তাবনা এবং সংবিধানের বিভিন্ন অংশে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান ছিল। এই সংশোধনের মাধ্যমে সেগুলিকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাবনার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে মাত্র।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ